OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 506*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**
*Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 502 - 506*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848*

# কালকূটের ভবঘুরেবৃত্তি : সমাজ ও সমকালের নির্মাণ

সায়নী হাজরা
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (অটোনমাস), কলকাতা
Email ID: sayanih1994@gmail.com

***Received Date*** *28. 09. 2025*
***Selection Date*** *15. 10. 2025*

***Keyword***
*Kalkut, Wandering, Bengali fiction, Twentieth century, Wanderlust, Human diversity, Modern society, Refection of turbulent times.*

***Abstract***

*The theme of bhabaghurebritti (wandering)—wandering without a clear aim—appears only occasionally in Bengali novels. The word bhabaghure, as explained in Bangiya Shabdakosh*[1]*, refers to one who roams without purpose, a homeless and unsettled figure. In life, as in fiction, most people remain within the safe boundaries of family and the familiar. Yet, Bengali literature has given us characters that repeatedly leave these enclosures to seek new paths. Kalkut, the literary persona of Samaresh Basu, is one such character.*

*While Samaresh Basu wrote extensively under his own name, his novels under the pseudonym Kalakut focus on journeys beyond the home. Kalkut openly admits to a "passion for seeing people." He does not go to the Kumbh Mela for religious merit, but to witness the diverse gathering of people from across India. For him, this diversity is sacred. Kalakut is a free wanderer whose primary goal is to experience the varied expressions of human life.*

*Born in 1924, Basu grew up during a time of global unrest that culminated in the Second World War. In the years that followed, India faced communal violence, Partition, and political turmoil. Democracy was established, but it also brought shameless power struggles and the seeds of distrust. It was in this troubled mid-twentieth-century context that Kalakut emerged— a name that itself means 'deadly poison.' His writing reflects the unrest of his times and the doubts of the educated middle class, where suspicion and ego often replaced trust. His wanderings became a way to search for freedom from narrowness and to discover greatness within ordinary human beings.*

*The journeys of Kalkut take place in an age defined by decline and distrust. Against this backdrop, he searches for faith—faith in humanity, in goodness, and in the ability to keep one's heart open*[2]*. His works such as Amritakumbher Sandhne and Kothaẏ Pabo Tare clearly reveal this quest.*

*Thus, the driving forces behind the wandering of Kalkut are threefold: a passion for observing people, a search for trust, and a longing for beauty—not superficial beauty, but the inner beauty of the human spirit, often clouded by urban deceit and selfishness. This paper explores why Kalkut could not*

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 506
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

*remain bound by familiar enclosures, why he was compelled to take to the road again and again, and how his wanderings embody the marks of modern society and his turbulent times. Through this, the study shows how the wandering of Kalkut is a reflection of his age.*

## Discussion

ভবঘুরে শব্দটির মাধ্যমে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যার কোনো স্থায়ী আশ্রয় নেই। যে ব্যক্তি পথে পথে ঘুরে বেড়ান, তাঁকে ভবঘুরে বলা হয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* অনুসারে ভবঘুরে শব্দের অর্থ হল, -

> "যে বৃথা সংসারে ঘুরে বেড়ায়; গৃহশূন্য, লক্ষ্মীছাড়া লোক।"[১]

ভবঘুরে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর *ভবঘুরে শাস্ত্র* গ্রন্থে। ভবঘুরেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তিনি। একজন ভবঘুরে কেমন হবেন, তাঁর কী কী গুণ থাকা আবশ্যক, তাঁর ঘুরে বেড়ানোর ধরণ কেমন হবে তার বিস্তারিত বিবরণও লেখক উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, -

> "ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভবঘুরেমির চেয়ে বড় কোনো জীবন্ত ধর্ম আর নেই। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ভবঘুরেদের ওপর।"[২]

কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়ন ভবঘুরেকে এমন উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেও সাধারণভাবে ভবঘুরে শব্দটি মানুষের কাছে নেতিবাচক অর্থই বহন করে। সাধারণ লোক ভবঘুরেদের প্রতি হীন মনোভাব পোষণ করে। বাংলা অভিধানগুলিতে শব্দটির অর্থ দেখলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু শ্রীকান্ত, অপু, কালকূট, নীললোহিত, হিমুর মতো বাংলা উপন্যাসে যেসব ভবঘুরে চরিত্রের দেখা আমরা পাই তারা যে শুধু ভবঘুরেবৃত্তির প্রতি সদর্থক মনোভাব পোষণ করে তা নয়, তারা স্বেচ্ছায় ভবঘুরেবৃত্তিকে বরণ করে নিয়েছে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে কালকূট চরিত্রটির ভবঘুরেবৃত্তির অন্তর্লীন কারণটি কী, তার ঘুরে বেড়ানোয় সমাজ ও সমকালের কোনো প্রভাব আছে কি না বা থাকলে কী প্রভাব আছে তা এই গবেষণাপত্রে আলোচ্য বিষয়। সমরেশ বসুর ছদ্ম নাম কালকূট। সমরেশ বসু নামে যে লেখাগুলি লেখক লিখেছেন তার থেকে কালকূটের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কয়েকটি পুরাণ, ইতিহাস, জীবনীমূলক গ্রন্থ বাদ দিলে কালকূটের সমস্ত রচনাই ঘুরে বেড়ানোর বিবরণ। এমনকি তাঁর পুরাণকেন্দ্রিক রচনা *শাম্ব*ও অভিশাপগ্রস্ত শাম্বের এক তীর্থ থেকে আরেক তীর্থে ঘুরে বেড়ানোর, আরোগ্যকে খুঁজে ফেরার কাহিনি। ভ্রমণ কাহিনি যেরূপে ঘুরে বেড়ানোর বিবরণ পাঠককে জানায়, সেভাবে নিশ্চয় নয়, তবু বৃহৎ অর্থে তাঁর রচনাগুলি ঘুরে বেড়ানোরই বিবরণ। কালকূটকে পাঠক কখনও ঘরে থাকতে দেখেন না। তিনি সবসময়ে চলমান। কখনও কুম্ভমেলা, কখনও কেঁদুলি, কখনও পুরী – কালকূট নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। কালকূটের এই ঘুরে বেড়ানো যে নিছক ভ্রমণ নয়, তা তাঁর নিজের লেখাতেই স্পষ্ট, -

> "একে আমি ভ্রমণ বলবো, তেমন সাহস নেই। আমার সে আয়োজনের সময় ছিল না। অকূলে যে ডোবে, মাটির আকাঙ্ক্ষা তার ভ্রমণ বিলাস নয়। ঘরে যার আগুন লেগেছে, জলাশয় তার সাঁতার-রঙ্গ নয়।"[৩]

কালকূট স্বভাবত বিবাগী। ঘর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না। ঘর ছাড়ার এক অপ্রতিরোধ্য টানে তিনি বারবার পথে বেরিয়ে পড়েন। কালকূট তাই ভ্রমণবিলাসী নয়, তিনি ভবঘুরে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায় 'প্রথম শ্রেণীর ভবঘুরে' অর্থাৎ ঘুরে বেড়ানোই যার জীবিকা, কালকূট তা না হলেও তাঁকে নিঃসন্দেহে ভবঘুরে বলা যায়।

কালকূটের ভবঘুরেবৃত্তির স্বরূপ অনুধাবন করতে গেলে তাঁর ঘুরে বেড়ানোর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। স্থান থেকে স্থানান্তরে তাঁর ভ্রমণ কতটা নিরবচ্ছিন্ন তা বোঝা যায় ঘুরে বেড়ানোর জায়গাগুলির নামের তালিকা থেকে। কালকূট বারবার ছুটে বেরিয়েছেন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। তাঁর ভ্রমণের স্থানগুলি ছড়িয়ে আছে সারা দেশের মানচিত্রে। তিনি যেমন ঘরের কাছে শুঁড়া দুর্গাপুর, কেঁদুলি, শান্তিনিকেতন, দার্জিলিঙে ঘুরেছেন, তেমনই পুরী, রাজগীর, বোম্বাই বা গুয়াহাটির মতো দূর শহরেও তাঁর পদচিহ্ন পড়েছে। মূলত নিসর্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে গেলেও শেষ পর্যন্ত নানা ধরণের মানুষের হৃদয় মন্দিরের থেকে বড় নিসর্গ তিনি আর খুঁজে পাননি। বাউল, তান্ত্রিক, শ্মশানযোগী থেকে শুরু

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 506*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা চরিত্রের সঙ্গে তাঁর ছিল অবাধ মেলামেশা। মানুষই তাঁর আরাধ্য দেবতা। এই দেবদর্শনের আশাতেই তিনি বারবার ছুটে বেড়িয়েছেন পথে প্রান্তরে। কালকূটের নিজের ভাষায়, -

> "মানুষ নামের মদে আমার বড় তৃষ্ণা। আকণ্ঠ পান করে আমি নেশা করেছি। তারপর নেশা গেছে, কিন্তু খোয়ারি কাটে না। তখন গড়াগড়ি যাই ধূলায়। তবু শক্তি পাই নে।"[৪]

প্রাথমিকভাবে কালকূটের ভবঘুরেবৃত্তির একটাই উদ্দেশ্য – মানুষ দেখার টান। কিন্তু যে কোনো সমাজবদ্ধ মানুষ সর্বদা অন্য মানুষ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে। তাহলে কালকূটকে 'মানুষ দেখার' জন্য এভাবে ছুটে বেড়াতে হয় কেন? সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে কালকূট শিক্ষিত বাঙালি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ, মুখের কথায় যাদের বলা হয় 'ভদ্রলোক'। নিজেকে তিনি বলেছেন, -

> "আমি সেই ...লোকে তাকে নাম দিয়েছে ভদ্রলোকের ছেলে। সেটাকে সে সাজিয়ে রেখেছে কোঁচার খুঁটের ভাঁজে ভাঁজে।... আমি সেই অগণিতদের একজন। যাদের রক্ত, মাংস, মেদ, বুদ্ধি বিকলো সওদাগরের গদীতে, যাদের শয্যা হল ছেঁড়া কাঁথা। তবু যাদের অমরত্বের তৃষ্ণা মিটল না।"[৫]

এই মানুষেরই পায়ে 'মনোবেড়ি', দু-চোখে 'রূপের তৃষ্ণা'। কালকূটের রচনায় 'রূপের তৃষ্ণা' শব্দবন্ধ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এই রূপ মানুষের অন্তরের সৌন্দর্যের রূপ। যে মানুষ আমাদেরই চারপাশে থাকে, কিন্তু নাগরিক কুটিলতায়, প্রাত্যহিকতায় মলিন হয়ে থাকে, চেনা গণ্ডির বাইরে বেরোলে তার রূপই আমাদের চোখে নতুন করে ধরা দেয়। মানুষের সেই মহত্তম প্রকাশকে কালকূট বারবার প্রত্যক্ষ করেছেন, শ্রদ্ধায় নত হয়েছেন তার পায়ে। কুম্ভমেলায় আপাত মুখরা, দুর্বিনীত প্রহ্লাদের দিদিমা অথবা ডাক্তার পাঁচুগোপাল রায়ের বজ্রগম্ভীর কাঠিন্য বা তীব্র বাক্যবাণের আড়ালে থেকে যাওয়া স্নেহের ফল্গুধারার সন্ধান যখন কালকূট পেয়েছেন, তখন রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করে শিহরিত হয়েছেন। আবার, মানুষের মধ্যে সবসময়ে শুধু যে মহত্তমকেই পেয়েছেন, তা নয়, মানুষের নীচতা, অসততাও প্রত্যক্ষ করেছেন। 'মন মেরামতের আশায়' বন্ধুর শ্বশুরালয়ের গ্রামে গিয়ে যে সানুদির সঙ্গ প্রাথমিকভাবে তাঁর ব্যথিত মনে অন্তরঙ্গতার প্রলেপ দিয়েছিল, পরে সেই সানুদির জীবিকা জেনে তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত মন আর মেরামত হয়নি। একই মানুষের মধ্যে নানা রিপুর, নানা আবেগ ও স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে কালকূটের সমস্ত রচনাই যেন অসংখ্য বিচিত্র মানুষের চিত্রশালায় পরিণত হয়েছে। তাই *নির্জন সৈকতে* অথবা *তুষারসিংহের পদতলে* ছুটে গেলেও শেষ পর্যন্ত মানুষই হয়ে থেকেছে তাঁর সব কৌতূহল ও দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য। এই মানুষ কেবল তাঁর নিজের শ্রেণীর নয়। তাঁর বিভিন্ন রচনার অংশ একাধিক চরিত্রকে দেখলে বোঝা যায়, কালকূটের মেলামেশা সমাজের সব স্তরের, সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে। কুম্ভমেলায় বলরামের মতো গ্রামীণ আখড়ার মূল গায়েন, পঙ্গু শিল্পীকে যেমন তিনি আপন করে নিয়েছেন, তেমনই হোটেল মালিক রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়ের দুঃখের অংশও তিনি নিয়েছেন। আবার রঞ্জিতা রিজভী, হেনা, এন্টনির মতো শিক্ষিত, কেতাদুরস্ত চরিত্রের সঙ্গেও তাঁর অনায়াস আলাপচারিতা চলে।

নিজের শ্রেণীর বাইরে বেরিয়ে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেশার, তাদের সুখ, দুঃখের অংশ নেওয়ার এই অদম্য টান নিজের সেই গণ্ডিকেই ভাঙতে চাওয়ার প্রয়াস। যে শ্রেণী তাঁকে এবং আমাদের সকলকেই জন্মলগ্ন থেকে কোনো না কোনো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করেছে, তাকেই ভাঙতে চেয়ে তাঁর এই ভবঘুরেবৃত্তি।

কালকূটের ভবঘুরেবৃত্তির অনুসন্ধানে কেবল যে তাঁর শ্রেণীগত অবস্থানটি বিবেচ্য, তা নয়, তাঁর সময়কালটিও গুরুত্বপূর্ণ। কালকূট নামটি লেখক তাঁর ছদ্মনাম হিসাবে কেন বেছে নিলেন তা দেখা প্রয়োজন। কালকূট শব্দের অর্থ প্রাণঘাতী বিষ। সমরেশ বসুর জন্ম উনিশশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে, বড় উত্তাল সময়ে। বিশ্বরাজনীতি তখন তোলপাড় অশান্তিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই সময়ে চলছে। বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দেখা দিল ভয়াবহ আর্থিক মন্দা। ভারতেও তার আঁচ এসে পড়েছিল। অতঃপর এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো উনচল্লিশে। সমরেশ বসুর তখন সদ্য কৈশোর। তাঁর বেড়ে ওঠা এই অশান্তির মধ্যেই। পরবর্তীকালে সাহিত্য জগতে এসে নাম নিলেন কালকূট। তাঁর নিজের কথায়, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 506
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "বিষের ধোঁয়া নিয়ে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছিলাম সেই বিষের ফোঁটা কপালে নিয়ে। যখন থেকে দেখতে শিখেছি, দেখেছি বিষ ক্ষতে ভরা দেশ। নিরন্নের মিছিল, অবিশ্বাস, ভয়, নিষ্ঠুরতা আর হাহাকার।"[৬]

এক সর্বব্যাপী অসহায় চিত্র। চারিদিকে কেবল সন্দেহ আর সংশয়। যার মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক মন পাপড়ি মেলতে পারে না কখনও। ভারতবর্ষের নগরগুলোয় তা আরও গভীর, আরও ভয়াবহ। বিশ্বযুদ্ধের পরেই আসে দাঙ্গা, তারপর স্বাধীনতা ও দেশভাগ। প্রতিষ্ঠিত হল সংসদীয় গণতন্ত্র আর তার সঙ্গেই ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ, অশ্লীল লড়াই। ধীরে ধীরে তা শিকড় চারিয়েছে সমাজের গভীরে আর গভীরতর হয়েছে অসুখ। অশান্তি, অপ্রেমের বীজ মাথা তুলেছে নির্মমভাবে। সেই বিষবৃক্ষ এখনও বাড়ছে। বিশ শতকের মধ্যভাগের এই অস্থির সময়েই কলম ধরেছেন কালকূট। কালকূটের ভবঘুরেবৃত্তি বুঝতে গেলে এই সময়টিকেও বোঝা জরুরি। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে আসে দেশভাগ ও বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। ভারতবাসীর দীর্ঘ লড়াই সফল হল তবু মানুষের সমস্যা বাড়ল বহুগুণ। দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। কারণ শষ্য উৎপাদন ও সেই শষ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল উদ্বাস্তু সমস্যা ও বেকারত্ব। অন্য দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের কিছু দেশে শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্রের জয়গান। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুমকি দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সব মিলিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে সামাজিক পরিস্থিতি ছিল অনিশ্চিত ও হতাশাপূর্ণ।

কালকূট নামে সমরেশ বসুর প্রথম রচনা *ভোট দর্পণ*। রাজনীতির তীব্র অমঙ্গলময় দিক এবং মানুষের সীমাহীন ভণ্ডামি উন্মোচিত হয়েছে রচনাটিতে। কালকূট নামের মধ্যেই এক হয়ে গেছে সমাজ এবং সমাজের বিষজর্জর ব্যক্তি। তবু এই হতাশা আর অসহায়তাতেই থামেননি তিনি। বিষের প্রভাব নিজের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন একাধিকবার। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মানসিকতার ফাঁকফোকরে বারংবার অনুভব করেছেন নাছোড় সন্দেহ আর সংশয়কে। অনুভব করে ব্যথিত হয়েছেন প্রতিবারই। মানুষের উপর অকারণ সন্দেহ আর অহং তাঁকে ধিক্কার জানিয়ে উন্মোচিত করেছে বিশ্বাস না করতে পারার গ্লানিকে। আর তা হয়েছে মানুষেরই সংস্পর্শে এসে। কুম্ভমেলায় হিদের মা কিংবা বলরামের সরল আস্থা চুরমার করে দিয়েছে তাঁর অহংকার। তিনি বলেছেন, -

> "হিদের মার জীবনে যা ভক্তি, যা বিশ্বাস, আমার তা নয়। হয়তো একেই বলে আত্মসম্মোহন। কিন্তু তার এই ভক্তি, বিশ্বাস দিয়েই সে আমার মনের সঙ্কীর্ণতার স্পর্ধাকে ভেঙে দিয়ে গেল।। ...সে এমনি করে দিয়ে যায়, তাকে এক টাকা দিয়ে আমি করুণার আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বিদ্রুপ নয়, কথা নয়, নিজের আনন্দ ও বেদনা দিয়ে সে আমার আত্মপ্রসাদকে ধিক্কার দিয়ে গেল। ...আমার নিজের বিশ্বাসের প্রতি হৃদয়ের সব দ্বার অসঙ্কোচে উন্মোচনের শিক্ষা দিয়ে গেল।"[৭]

এই শিক্ষা, সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তির সন্ধানই তাঁর সব ভ্রমণের প্রেরণা। চারিদিকের ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ মানসিকতার ভীড়ে কালকূট খুঁজে বেড়ায় মহত্তরকে সেই মানুষেরই মধ্যে, প্রাত্যহিকতার গ্লানিতে যারা নিতান্ত সাধারণভাবে ঘুরে বেড়ায় আমাদের চারপাশে। বিশ শতকের এই আধুনিক সময় এমন একটি সময়, যা মানুষকে ছোট থেকে শেখায় সন্দেহ করতে। প্রতিবেশীকে সন্দেহ, প্রশাসনকে সন্দেহ এমনকি যেকোনো অপরিচিত মানুষকেও আমরা প্রাথমিকভাবে অপকারী বা শত্রু ভেবে সন্দেহ করে থাকি। কালকূটেরই অপর সত্তা সমরেশ বসুর *আদাব* গল্পটিতে দাঙ্গার ভয়ে বিধ্বস্ত দুটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের প্রথম আলাপটাই যেমন সন্দেহ আর সংশয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেই আলাপচারিতা সম্প্রীতির আদাব শব্দে শেষ হলেও শুরুর সন্দেহটিকে সচেতন পাঠক কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। *অমৃতকুম্ভের সন্ধানে* উপন্যাসে হিদের মা যখন সাধুকে খাওয়াচ্ছিলেন তখন সাধু খাওয়ানোর মূল্যটি তাঁকেই চোকাতে হবে ভেবে হিদের মার প্রতি কালকূটের যে তীব্র সন্দেহ, অস্বস্তি এমনকি বিপন্নতার বোধ সেটিও মানুষকে সহজ মানবিকতার স্থান থেকে বিশ্বাস করতে না পারারই এক প্রকাশ। সমালোচক ড. ঝুমা রায়চৌধুরীর মতে, -

> "ব্যক্তি ক্রমশ সমাজের কাছে তার দাবী না মেটায়, তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা না পাওয়ায় হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে তখন নিজের মনোজগতে হারিয়ে যেতে চেয়েছে।"[৮]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 59
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 506
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমালোচক এই মন্তব্য *বিবর* উপন্যাসের প্রসঙ্গে করেছেন। তবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার এই প্রবণতা কালকূটের ভবঘুরে বৃত্তিতে আরও স্পষ্ট হয়েছে। কালকূট তাঁর চারপাশের গণ্ডিবদ্ধ সমাজের অংশ হতে পারছেন না বা হতে চাইছেন না। নিজের শ্রেণী থেকে তিনি বারবার সরে আসছেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন বর্গের মানুষের সঙ্গে মিশছেন। প্রচলিত বিচ্ছিন্নতা বা এলিয়েনেশনের বিপরীতে একে এক বিকল্প সংযোগ বলা যায়। এই সংযোগের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মানুষ দেখার নেশার প্রধান কারণ। বিভিন্ন মানুষের অন্তর্গত আনন্দ, বেদনা, হতাশা ও সংকীর্ণতা কালকূটকে দিয়েছে বৈচিত্র্যের সন্ধান। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন এই বিচিত্র চরিত্রের জীবন।

কালকূটের নিজের কথায় মানুষের সঙ্গে মেশা তাঁর নিজেকেই খুঁজে ফেরা। লালনগীতি 'ঘরের কাছে আরশীনগর'-এর আরশীনগরটি কালকূটের কাছে জগৎ ও জগৎজন। সেখানে বসত করা পড়শীটি কালকূট নিজে।[৯] নিজের হারিয়ে যাওয়া আস্থা ও বিশ্বাস তাই কালকূট খুঁজে ফেরেন অপরের মধ্যে।

বনের যে হরিণ কোনোদিন শিকারীর সম্মুখীন হয়নি, মানুষের প্রতি তার যে অসঙ্কোচ নির্ভরতা, আস্থা, মানুষ সেই সরলতার জায়গা থেকে বহুদিন সরে এসেছে। অথচ ওই বিশ্বাস করতে পারার ক্ষমতা মানুষের সহজাত। এই আস্থা মানুষের প্রতি আস্থা, শুভবোধের প্রতি আস্থা, সর্বোপরি নিজের বিশ্বাসের প্রতি হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে পারার আস্থা। আধুনিকতার মূল্যস্বরূপ এই আস্থা নাগরিক মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। নগর ছেড়ে ভারতবর্ষের পথে পথে কালকূটের এই ভ্রমণ সেই আস্থা খুঁজে ফেরারই নামান্তর। নিজের সামাজিক, অর্থনৈতিক শ্রেণীর গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের রূপের ভিতর চিরকালীন মূল্যবোধের যে প্রকাশ তারই খোঁজে কালকূটের ভবঘুরেবৃত্তি। প্রকারান্তরে এই ভবঘুরেবৃত্তি কালকূটের নিজেকেই খুঁজে ফেরা। অর্থাৎ অপরের মধ্যে নিজেকেই খুঁজে ফিরেছেন কালকূট।

মানুষ হিসাবে মানুষকে বিশ্বাস না করতে পারার যে গ্লানি, সমকাল ও সমাজ তা কালকূটকে উপহার দিয়েছে। দিয়েছে অনাস্থা, অবিশ্বাস আর সন্দেহের কুটিল আবর্ত। 'নাগরিক ক্লান্তি'তে তাই যখনই মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তখনই কালকূট বেরিয়ে পড়েন মানুষ দেখার নেশায়। মানুষের মধ্যে বিচিত্র রঙ্গ প্রত্যক্ষ করতে। পথে দেখা হয় নানা ধরণের নানা মানুষের সঙ্গে। সেই সঙ্গই তাঁর পাথেয়, তাঁর গন্তব্যও সেখানেই। কালকূটের ভবঘুরেবৃত্তিকে তাই নির্মাণ করেছে তাঁরই সমাজ ও সমকাল। সমকালের বিষের পাত্র চিরকালের মানবিকতার অমৃতে ভরে তুলতেই তাঁর ভবঘুরেবৃত্তি।

## Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমী, ১৩৪০-১৩৫৩, নিউ দিল্লি, পৃ. ১৬৫৬

২. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *ভবঘুরে শাস্ত্র*, অনুবাদক রণজিৎ সিংহ, প্রথম সংস্করণ জুন, ১৯৮১, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ১৫

৩. কালকূট, *নির্জন সৈকতে*, *কালকূট রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, অক্টোবর ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬৭

৪. কালকূট, *নির্জন সৈকতে*, *কালকূট রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, অক্টোবর ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬৬

৫. কালকূট, *নির্জন সৈকতে*, *কালকূট রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, অক্টোবর ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৩৬৭

৬. কালকূট, *অমৃতকুম্ভের সন্ধানে*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কার্তিক ১৩৬১, পৃ. ৬২

৭. কালকূট, *অমৃতকুম্ভের সন্ধানে*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কার্তিক ১৩৬১, পৃ. ১৮৪

৮. রায়চৌধুরী, ড. ঝুমা, *লেখক সমরেশ বসুর সমকালীন প্রেক্ষাপটে সাহিত্য পর্যালোচনা*, *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ণ*, পূর্বাশা, জানুয়ারি ২০০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৬১

৯. কালকূট, *গাহে অচিন পাখি*, *কালকূট রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, অক্টোবর ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৪২